অধ্যায় ১০

উদ্ভিদের প্রজনন
PLANT REPRODUCTION

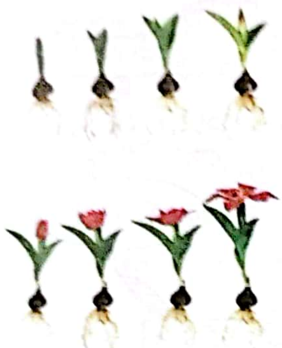

আমরা প্রতিদিন ভাত, রুটি, বিভিন্ন ফল ও সবজি খেয়ে থাকি। রান্নার কাজে সরিষা, সয়াবিন, পামওয়েল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। এসব খাদ্যের সব কিছুই আসে উদ্ভিদ থেকে। ধান, গম, সরিষা, সয়াবিন, বিভিন্ন ফল সব কিছুই প্রকৃতপক্ষে স্ব স্ব উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি তথা প্রজননের একটি উপাদান। অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের প্রজননে এ ধরনের বীজ কিংবা ফলের সৃষ্টি হয় না। এ অধ্যায়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের প্রজনন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- ❑ পুষ্প
- ❑ অমরা
- ❑ পরাগরেণু
- ❑ নিষেক
- ❑ ডিম্বক
- ❑ অঙ্গজ জনন
- ❑ পার্থেনোজেনেসিস
- ❑ গ্যামিটোফাইট
- ❑ কৃত্রিম প্রজনন

পিরিয়ড সংখ্যা ৫: এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে-	
শিখনফল	বিষয়বস্তু
১। বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ২। বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ৩। কৃত্রিম প্রজননের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪। কৃত্রিম প্রজননের উপায় হিসেবে উদ্ভিদের সংকরায়ন বর্ণনা করতে পারবে। ৫। কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● প্রজননের প্রকারভেদ ○ যৌন জনন ○ অযৌন জনন ○ পার্থেনোজেনেসিস ● কৃত্রিম প্রজনন ○ ধারণা ○ উদ্ভিদের সংকরায়ন প্রক্রিয়া ○ গুরুত্ব

১০.১ প্রজননের প্রকারভেদ (Types of Reproduction)

প্রজনন প্রতিটি জীবের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও সহজাত প্রবৃত্তি। যে প্রক্রিয়ায় কোনো জীব তার বংশধর বা অনুরূপ এক বা একাধিক জীব উৎপাদন করে তাকে প্রজনন বলে। জীবে দুভাবে প্রজনন সংঘটিত হয়। যথা- অযৌন প্রজনন ও যৌন প্রজনন। প্রজননের যে প্রক্রিয়ায় একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন লিঙ্গের জীব হতে সৃষ্ট জননকোষ বা গ্যামিটের প্রয়োজন হয় তাকে যৌন প্রজনন বলে। এক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী দুটি জননকোষ অর্থাৎ পরাগরেণু বা শুক্রাণু ও ডিম্বক বা ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে এবং জাইগোট ক্রমবিকশিত হয়ে অপত্য জীব সৃষ্টি করে। অন্যদিকে প্রজননের যে প্রক্রিয়ার কোনো জননকোষ সৃষ্টি হয় না তাকে অযৌন প্রজনন বলে। সাধারণত বিভাজন, মুকুলোৎপাদন, পুনরুৎপাদন, অঙ্গজ জনন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় অযৌন প্রজনন সম্পন্ন হয়। যৌন জননক্ষম কোনো কোনো উদ্ভিদের অনিষিক্ত গ্যামিট বিকশিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ জন্ম দেয়। অনিষিক্ত গ্যামিট হতে ভ্রূণ তথা নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে পার্থেনোজেনেসিস বা অপুংজনি বলে।

উদ্ভিদের যৌন প্রজনন (Sexual reproduction in plant)

যৌন প্রজননের বৈশিষ্ট্য/গুরুত্ব

১। যৌন প্রজননে জনন অঙ্গের বিকাশ ঘটে, গ্যামিট সৃষ্টি হয়।

২। এ প্রক্রিয়া মাইটোসিস ও মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

৩। এতে জীবনচক্র কিংবা জনুক্রমের সূচনা ঘটে।

৪। যৌন প্রজননে সৃষ্ট উদ্ভিদে প্রকরণ সৃষ্টি হয় ফলে বৈচিত্র্য আসে।

৫। এক্ষেত্রে একাধিক জটিল দশা অতিক্রম করে।

৬। এতে এক সাথে অল্প সংখ্যক উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় এবং উদ্ভিদের জীবনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৭। এক্ষেত্রে উদ্ভিদে বিলম্বে ফল সৃষ্টি হয়।

৮। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে যৌন জনন ঘটে।

আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন

আবৃতবীজী সকল উদ্ভিদই যৌন জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এদের জননাঙ্গ থেকে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর সৃষ্টি হয়। এসব উদ্ভিদের পুষ্প বা ফুল জননাঙ্গ ধারণ করে। কোনো কোনো উদ্ভিদের একই পুষ্পে পুং ও স্ত্রী উভয় জননাঙ্গই বিদ্যমান থাকে। এধরনের পুষ্পকে **উভলিঙ্গ পুষ্প** (bisexual flower) বলে। জবা, ধুতুরা ইত্যাদি উভলিঙ্গ প্রকৃতির পুষ্প। আবার কোনো কোনো উদ্ভিদে পুং ও স্ত্রী জননাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পে অবস্থান করে। এধরনের পুষ্পকে **একলিঙ্গ পুষ্প** (unisexual flower) বলে। লাউ, কুমড়া ইত্যাদি একলিঙ্গ প্রকৃতির পুষ্প।

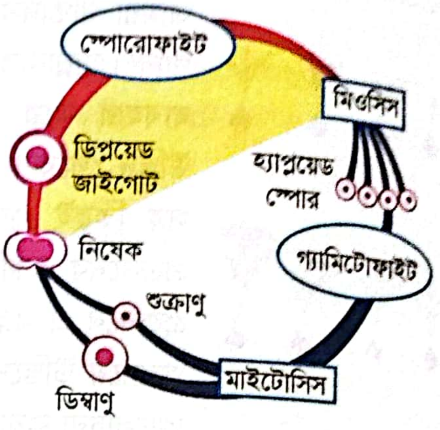

চিত্র ১০.১ উদ্ভিদের যৌন প্রজনন

একলিঙ্গ পুষ্পের ক্ষেত্রে পুং ও স্ত্রী পুষ্প উভয়ই যখন একই উদ্ভিদে জন্মে তখন তাদের **সহবাসী উদ্ভিদ** (monoecious plant) বলে। যেমন- লাউ ও কুমড়া সহবাসী উদ্ভিদ। অন্যদিকে এরা যখন ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদে জন্মে তখন তাদের **ভিন্নবাসী উদ্ভিদ** (dioecious plant) বলে। তাল ও পেপে ভিন্নবাসী উদ্ভিদ। নিম্নে একটি উভলিঙ্গ পুষ্পের গঠন বর্ণনা করা হলো:

পুষ্পের/ফুলের গঠন (Structure of flower)

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের বংশরক্ষা ও বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে ফল ও বীজ উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত বিটপকে (কাণ্ডকে) পুষ্প বা ফুল বলে। উদ্ভিদের আদর্শ পুষ্পের একটি অক্ষ এবং চারটি স্তবক থাকে। পুষ্পের অক্ষকে **পুষ্পাক্ষ** (floral disk) বলা হয়। এ পুষ্পাক্ষের উপর সর্পিলাকারে বা আবর্তকারে চারটি স্তবক সজ্জিত থাকে। স্তবকগুলো হলো-বৃতি (calyx), দলমণ্ডল (corolla), পুংস্তবক (androecium) ও স্ত্রীস্তবক (gynoecium)। এদের মধ্যে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক সরাসরি প্রজনন কাজে অংশগ্রহণ করে। এজন্য এদের জনন স্তবক বা অত্যাবশ্যকীয় স্তবক বলে। অন্যদিকে বৃতি ও দলমণ্ডল জনন কাজে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। এজন্য এদেরকে সাহায্যকারী স্তবক বলা হয়। নিম্নে একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দেয়া হলো-

১। **বৃতি** (Calyx): ফুলের সর্ববাহিরের আবর্তে বিদ্যমান স্তবককে বৃতি বলে। এটি পাতার ন্যায় সবুজ বর্ণের এবং কয়েকটি অংশে বিভক্ত। বৃতির প্রতিটি অংশকে বৃত্যাংশ বলে। কোনো কোনো ফুলে (যেমন-জবা) বৃতির নিচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবৃতি (epicalyx) থাকে।

কাজ: (i) মুকুল অবস্থায় ফুলের অন্যান্য সকল অংশকে রক্ষা করাই বৃতির প্রধান কাজ।

(ii) সবুজ বর্ণের বৃতি সালোকসংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

(iii) উজ্জ্বল বর্ণের বৃতি পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে পরাগায়ণে সহায়তা করে।

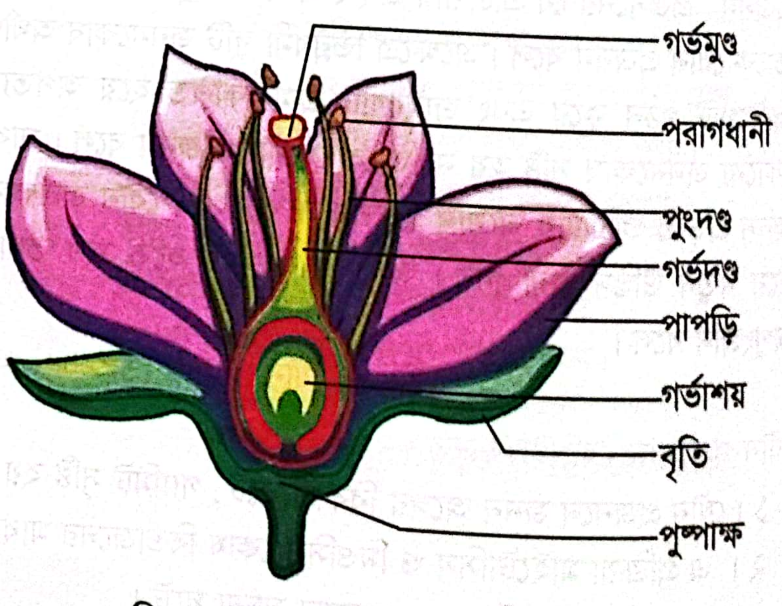

চিত্র ১০.২ একটি পুষ্পের লম্বচ্ছেদ

২। **দলমণ্ডল** (Corolla): ফুলের দ্বিতীয় আবর্তে অর্থাৎ বৃতির ভেতরে অবস্থিত স্তবককে দল বা দলমণ্ডল বলে। দলমণ্ডলের প্রতিটি অংশকে দলাংশ বা পাপড়ি (petals) বলে। পাপড়ির সংখ্যা বিভিন্ন ফুলে বিভিন্ন হয়। এগুলো একই রকম বা ভিন্ন রকম হয় এবং মুক্ত বা সংযুক্ত থাকে। ফুলের দলমণ্ডল সাধারণত উজ্জ্বল বর্ণের ও সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত হয়। অনেক উদ্ভিদের ফুলের দলমণ্ডল ও বৃতিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এক্ষেত্রে মিলিত স্তবককে পুষ্পপুট (perianth) বলে। রজনীগন্ধার পুষ্পে পুষ্পপুট থাকে।

কাজ: (i) দলমণ্ডলের উজ্জ্বল বর্ণ পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে পরাগায়ণে সহায়তা করে।
(ii) মুকুল অবস্থায় ফুলের ভেতরের দুটি স্তবককে সুরক্ষা করে।

৩। **পুংস্তবক** (Androecium): ফুলের তৃতীয় স্তবক অর্থাৎ দলমণ্ডলের ভেতরের স্তবককে পুংস্তবক বলে। এর প্রতিটি অংশকে পুংকেশর বা পুংরেণুপত্র (stamen or microsporophyl) বলে। একটি ফুলে এক বা একাধিক পুংকেশর থাকে। সাধারণত পুংকেশরগুলো পুষ্পাক্ষের উপর চক্রাকারে সজ্জিত থাকে। প্রতিটি পুংকেশর থলির ন্যায় পরাগধানী (anther) এবং দণ্ডাকৃতির পুংদণ্ড (filament) নিয়ে গঠিত। অধিকাংশক্ষেত্রে প্রতিটি পরাগধানীর একাধিক অংশ থাকে। এদের পরাগথলি (pollen sac) বলে। পরাগথলিগুলো সাধারণ যোজক দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে।

কাজ: পুংস্তবকের পরাগথলিতে পরাগরেণু (pollen grain) সৃষ্টি হয়।

৪। **স্ত্রীস্তবক** (Gynoecium): ফুলের চতুর্থ স্তবক বা ফুলের কেন্দ্রে অবস্থিত স্তবকটিকে স্ত্রীস্তবক বলে। এর প্রতিটি অংশকে গর্ভপত্র বা স্ত্রীরেণুপত্র (carpel) বলে। একটি স্ত্রীস্তবক এক বা একাধিক গর্ভপত্র দ্বারা গঠিত হতে পারে। প্রতিটি গর্ভপত্রে গর্ভাশয় (overy), গর্ভদণ্ড (style) ও গর্ভমুণ্ড (stigma) নামক তিনটি অংশ থাকে। গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বক (ovule) উৎপন্ন হয়। ডিম্বক যে বিশেষ টিস্যুর উপর সৃষ্টি হয় তাকে অমরা (placenta) বলে।

কাজ: স্ত্রীস্তবকের গর্ভাশয় ডিম্বক ধারণ করে। নিষেকের ফলে গর্ভাশয়টি ফলে এবং ডিম্বকটি বীজে পরিণত হয়।

আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌনজনন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌনজনন প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়:

১। পরাগরেণুর পরিস্ফুটন (Development of microsporangia)
২। পুং গ্যামিটোফাইটের পরিস্ফুটন (Development of male gametophyte)
৩। ডিম্বকের পরিস্ফুটন (Development of ovule)
৪। স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের পরিস্ফুটন (Development of female gametophyte)
৫। পরাগায়ণ (Pollination)
৬। নিষেক (Fertilization)
৭। ভ্রূণের পরিস্ফুটন (Embryonic development)

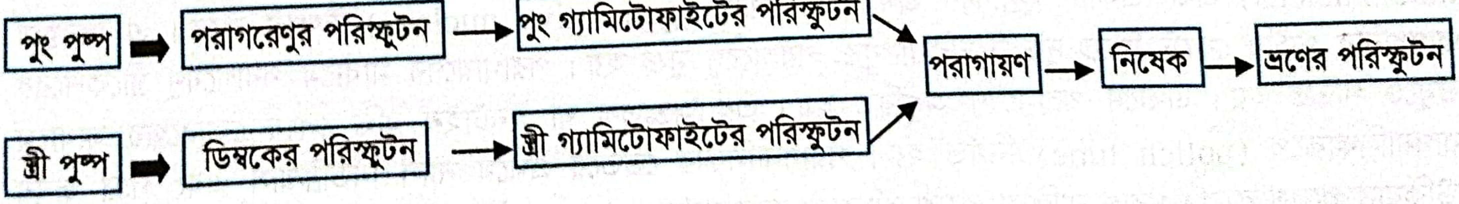

১। পরাগরেণুর পরিস্ফুটন (Development of microsporangia)

উদ্ভিদের পরাগরেণু বা পুংরেণুর পরিস্ফুটন ফুলের পুংস্তবকের পরাগধানীর পরাগথলিতে সংঘটিত হয়। অপরিণত পরাগধানী আয়তাকার এবং উহা একই ধরনের ভাজক টিস্যু দ্বারা গঠিত হয়। পরিণত পরাগধানী একাধিক খণ্ডে বিকশিত হয়ে পরবর্তীতে পরাগথলি গঠন করে। প্রতিটি খণ্ডের অধঃত্বক বা হাইপোডার্মিসের কিছু কোষ বৃহৎ নিউক্লিয়াস ও ঘন সাইটোপ্লাজমসহ অন্যান্য কোষ হতে আকারে বড় হয়। এসব কোষকে আর্কিস্পোরিয়াম (archesporium) বা

আর্কিস্পোরিয়াল কোষ (archesporial cell) বলে। আর্কিস্পোরিয়াল কোষগুলো ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে পরিধির দিকে প্রাথমিক প্যারাইটাল কোষস্তর (primary parietal cell layer) এবং কেন্দ্রের দিকে প্রাথমিক জননকোষ (primary sporogenous cells) গঠন করে।

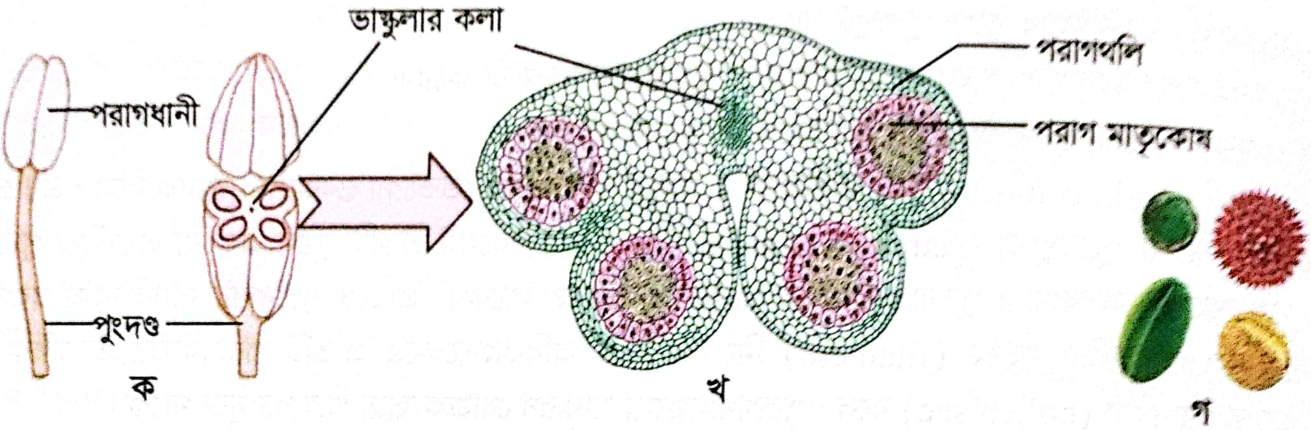

চিত্র ১০.৩ (ক) একটি পুংকেশর ও (খ) একটি পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ (গ) কয়েকটি পরাগরেণু

প্রাথমিক প্যারাইটাল কোষস্তরের কোষগুলো বিভাজিত হয়ে বহুস্তর বিশিষ্ট পরাগধানীর একটি প্রাচীর গঠন করে। প্রাথমিক জননকোষগুলো সরাসরি পরাগ মাতৃকোষ হিসেবে কাজ করে অথবা পুনরায় বিভাজিত হয়ে অধিক সংখ্যক পরাগ মাতৃকোষ সৃষ্টি করে। পরাগ মাতৃকোষের উপরে বিন্যস্ত পরাগধানীর প্রাচীরের কোষগুলোর সর্ব ভেতরের স্তরটিকে ট্যাপেটাম (tapetum) বলে। এটি বিগলিত হয়ে পরিস্ফুটনরত পরাগরেণুকে পুষ্টি সরবরাহ করে। প্রতিটি ডিপ্লয়েড (2n) পরাগ মাতৃকোষ মিওসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) পরাগরেণু সৃষ্টি করে।

পরাগরেণুর গঠন

পরাগরেণু গোলাকার, ডিম্বাকার বা ত্রিভূজাকার হতে পারে। এদের ব্যাস 10-70 মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে। প্রতিটি পরাগরেণু এককোষী ও এক নিউক্লিয়াস (হ্যাপ্লয়েড) বিশিষ্ট হয়। প্রতিটি পরাগরেণু দুটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। বাইরের আবরণটি দৃঢ়, স্পোরোপোলেনিনযুক্ত ও পুরু। একে বহিঃত্বক বা এক্সাইন (exine) বলে। বহিঃত্বক বিভিন্নভাবে অলঙ্কৃত থাকায় অমসৃণ প্রকৃতির হয়। পরাগরেণুর ভেতরের আবরণটি পাতলা, সূক্ষ্ম ও সেলুলোজ গঠিত। একে অন্তঃত্বক বা ইনটাইন (intine) বলে। বহিঃত্বকে এক বা একাধিক ক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকে, এদের রেণুরন্ধ্র (germ pore) বলে।

২। পুং গ্যামিটোফাইটের পরিস্ফুটন (Development of male gametophyte)

পরাগরেণু হলো পুংগ্যামিটোফাইটের সূচনাকারী কোষ। পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগমের প্রাথমিক পর্যায় পরাগথলির মধ্যেই শুরু হয়। প্রথমে পরাগরেণুর হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয়ে একটি বৃহদাকার নালি নিউক্লিয়াস (tube nucleus) এবং একটি ক্ষুদ্রাকার জনন নিউক্লিয়াস (generative nucleus) উৎপন্ন করে। এ অবস্থায় পরাগধানীর প্রাচীর ফেটে গিয়ে দুই নিউক্লিয়াসযুক্ত পরাগরেণু মুক্ত হয়। পরাগায়ণের মাধ্যমে পরাগরেণু স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়। এখানে পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয়। এর অন্তঃত্বক বা ইনটাইন বৃদ্ধি পেয়ে রেণুরন্ধ্রের মাধ্যমে পরাগনালিকারূপে (pollen tube) নির্গত হয়। পরাগনালিকার ভেতরে প্রথমে নালি নিউক্লিয়াস এবং পরে জনন নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে। পরাগ নালিকা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে গর্ভদণ্ডের ভেতর দিয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটি পুংগ্যামিট বা শুক্রাণু সৃষ্টি করে। শুক্রাণুসহ পরাগ নালিকা এবং পরাগরেণুকে একত্রে পুং গ্যামিটোফাইট বলে।

৩। ডিম্বকের পরিস্ফুটন (Development of ovule)

অপরিণত ও অনিষিক্ত বীজকে ডিম্বক বলে। স্ত্রীস্তবকের গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বাণু বা স্ত্রীরেণুযুক্ত ডিম্বক (ovule) গঠিত হয়। গর্ভাশয়ে একটি বিশেষ টিস্যুর উপর ডিম্বক সৃষ্টি হয়, একে অমরা (placenta) বলে। অমরার একটি নির্দিষ্ট

অঞ্চল স্ফীত হয়ে ডিম্বকে পরিণত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ডিম্বকে দুধরনের টিস্যু থাকে, যথা- বাইরের আবরণী টিস্যু এবং ভেতরের ভ্রূণপোষক টিস্যু বা নিউসেলাস টিস্যু। পরবর্তীতে বাইরের আবরণী টিস্যু থেকে নিউসেলাস টিস্যুর চারদিকে বহিঃত্বক ও অন্তঃত্বক সৃষ্টি হয়। ডিম্বকের অগ্রভাগে নিউসেলাসের কিয়দংশ উন্মুক্ত থেকে মাইক্রোপাইল (micropyle) বা ডিম্বকরন্ধ্র নামক বিশেষ ছিদ্রের সৃষ্টি করে। একটি ফিউনিকুলাস বা ডিম্বকবৃন্তের সাহায্যে ডিম্বক অমরার সাথে সংযুক্ত থাকে।

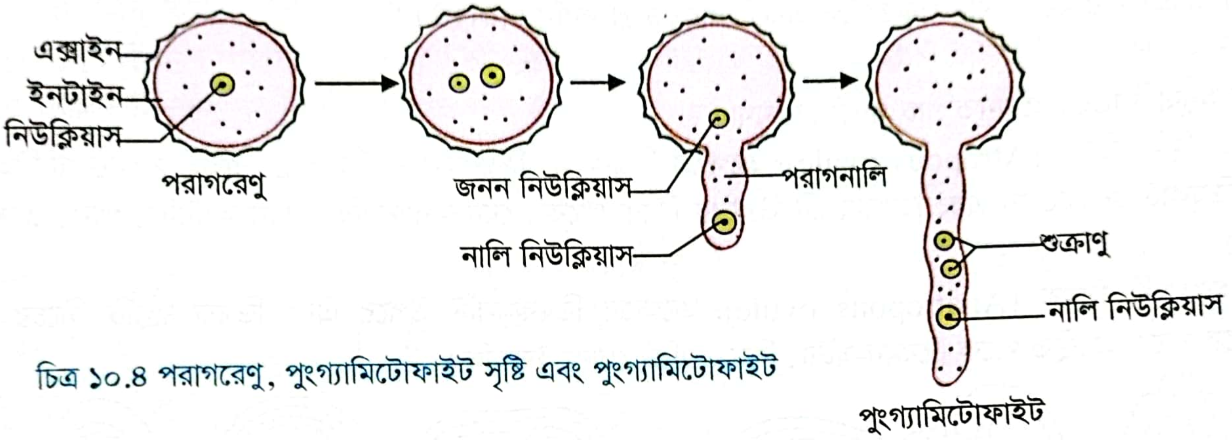

চিত্র ১০.৪ পরাগরেণু, পুংগ্যামিটোফাইট সৃষ্টি এবং পুংগ্যামিটোফাইট

ডিম্বকের ভ্রূণপোষক টিস্যুর যে কোনো একটি কোষ আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এর সাইটোপ্লাজম ঘন এবং নিউক্লিয়াস বৃহদাকৃতির হয়। এ কোষকে **প্রাইমারি আর্কিস্পোরিয়াল কোষ** (primary archaesporial cell) বলা হয়। প্রাইমারি আর্কিস্পোরিয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে একটি **প্রাইমারি প্যারাইটাল কোষ** (primary parietal cell) এবং একটি **প্রাইমারি জননকোষ** (primary sporogenous cell) গঠন করে অথবা সরাসরি স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ হিসেবে কাজ করে। ডিপ্লয়েড (2n) স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে এক সারিতে বিন্যস্ত 4টি হ্যাপ্লয়েড (n) স্ত্রীরেণু বা **মেগাস্পোর** (megaspore) সৃষ্টি করে। ডিম্বকমূলের দিকে বিন্যস্ত স্ত্রীরেণুটি সক্রিয় থাকে এবং মাইক্রোপাইলের দিকে বিন্যস্ত অবশিষ্ট 3টি স্ত্রীরেণু বিনষ্ট হয়ে যায়।

ডিম্বকের গঠন (Structure of an ovule)

একটি পরিণত ডিম্বক নিম্নলিখিত 7টি অংশ নিয়ে গঠিত-

১. **ডিম্বকবৃন্ত** (Funiculus): যে সরু বোঁটার ন্যায় গঠন দ্বারা ডিম্বক অমরার সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে ডিম্বকবৃন্ত বলে।

২. **ডিম্বকনাভি** (Hilum): ডিম্বকের সহিত ডিম্বকবৃন্তের সংযোগস্থলকে ডিম্বকনাভি বলে।

৩. **ডিম্বক মূল** (Chalaza): ডিম্বকের নিম্নদেশের যে বিশেষ স্থান হতে ডিম্বকত্বক উদ্ভূত হয় তাকে ডিম্বক মূল বলে।

৪. **ডিম্বকত্বক** (Integument): ডিম্বকের সর্ব বাহিরের আবরণীকে ডিম্বকত্বক বলে। এটি এক বা দুইস্তর বিশিষ্ট।

চিত্র ১০.৫ একটি নিম্নমুখী/অধোমুখী ডিম্বকের লম্বচ্ছেদ

৫. ভ্রূণপোষক টিস্যু (Nucellus tissue): ডিম্বকত্বক দ্বারা আবৃত প্যারেনকাইমা কোষ গঠিত যে টিস্যু ডিম্বকের মূলদেহ গঠন করে তাকে ভ্রূণপোষক টিস্যু বলে।

৬. ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle): ডিম্বকের অগ্রভাগে ভ্রূণপোষক টিস্যুর কিয়দংশ উন্মুক্ত থেকে যে বিশেষ ছিদ্রের সৃষ্টি করে তাকে মাইক্রোপাইল বা ডিম্বকরন্ধ্র বলে।

৭. ভ্রূণথলি (Embryosac): ডিম্বকরন্ধ্রের নিকটে ভ্রূণপোষক টিস্যুর মধ্যে বিদ্যমান বৃহদাকার থলির মতো গঠনকে ভ্রূণথলি বা ভ্রূণাধার বলে। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি পরিণত স্ত্রী গ্যামিটোফাইট।

ডিম্বকের প্রকার

আকৃতি অনুযায়ী ডিম্বক প্রধানত পাঁচ প্রকারের, যথা-

১. ঊর্ধ্বমুখী ডিম্বক (Atropous ovule): এক্ষেত্রে ডিম্বকবৃন্ত, ডিম্বকমূল ও ডিম্বকরন্ধ্র একই সরলরেখায় অবস্থিত থাকায় ডিম্বকটি সোজাভাবে এবং ডিম্বকরন্ধ্রটি উপরের দিকে থাকে। যেমন-পানিমরিচ, বিষ কাটালি, পান, গোলমরিচ ইত্যাদি।

২. অধোমুখী ডিম্বক (Anatropous ovule): এক্ষেত্রে ডিম্বকমূলটি উপরে এবং ডিম্বক রন্ধ্রটি নিচের দিকে ডিম্বকবৃন্তের পাশে অবস্থিত থাকে। যেমন-মটর, শিম, রেড়ি, ছোলা ইত্যাদি।

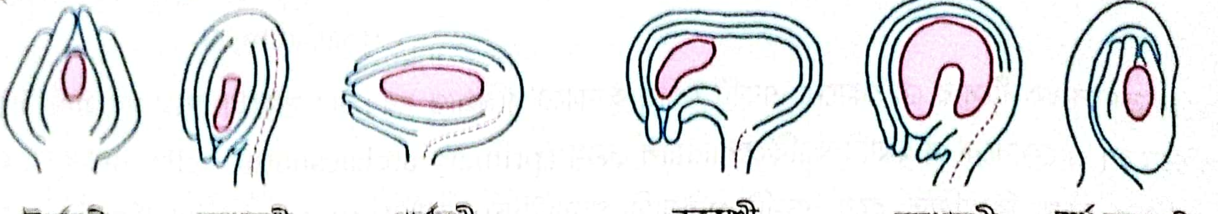

চিত্র ১০.৬ উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের ডিম্বক

৩. পার্শ্বমুখী ডিম্বক (Amphitropous ovule): এক্ষেত্রে ডিম্বকটি ডিম্বকবৃন্তের সাথে লম্বভাবে সংযুক্ত থাকে। ডিম্বকবৃন্তের একদিকে ডিম্বকমূল এবং অপরদিকে ডিম্বকরন্ধ্র একই সরল রেখায় অবস্থান করে। যেমন-পপি বা আফিম, পালিক, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি।

৪. বক্রমুখী ডিম্বক (Campylotropous ovule): এক্ষেত্রে ডিম্বকটি এমনভাবে বক্র হয় যাতে ডিম্বকরন্ধ্রটি ডিম্বক নাভির পার্শ্বে অবস্থান করে। এতে ডিম্বকবৃন্তের এক পার্শ্বে থাকে ডিম্বকমূল এবং অপর পার্শ্বে থাকে ডিম্বকরন্ধ্র। যেমন-সরিষা, কাল্কাসুন্দা ইত্যাদি।

৫. অর্ধ-অধোমুখী ডিম্বক (Hemi-anatropous ovule): এক্ষেত্রে ডিম্বকটি এমনভাবে বক্র হয় যাতে ভ্রূণস্থলিটি অশ্বক্ষুরাকৃতির হয়। এক্ষেত্রেও ডিম্বকবৃন্তের একপার্শ্বে থাকে ডিম্বকমূল এবং অপর পার্শ্বে থাকে ডিম্বকরন্ধ্র। যেমন- পিঙ্ক, ছোটকুট ইত্যাদি।

৪। স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের পরিস্ফুটন (Development of female gametophyte)

অধিকাংশ (75%) আবৃতবীজী উদ্ভিদ মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় স্ত্রী গ্যামিটোফাইট গঠন করে অর্থাৎ গ্যামিটোফাইট গঠনে একটিমাত্র স্ত্রীরেণু অংশগ্রহণ করে। ডিম্বাণু বা স্ত্রীরেণু হলো স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের সূচনাকারী কোষ। স্ত্রীরেণু বিকশিত হয়ে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট গঠন করে। এসময় নিম্নলিখিত ধারাবাহিক পরিবর্তনগুলো ঘটে:

১. প্রথমে স্ত্রীরেণুটি আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং উহার নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে।

২. অপত্য নিউক্লিয়াস দুটি পরস্পর হতে পৃথক হয়ে স্ত্রীরেণু কোষের দুই মেরুতে অবস্থান করে।

৩. প্রতিটি অপত্য নিউক্লিয়াস পুনরায় মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে 4টি নিউক্লিয়াস গঠন করে। ইতোমধ্যে স্ত্রীরেণু কোষটিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থলির আকার ধারণ করে ভ্রূণথলি গঠন করে।

৪. পরবর্তী বিভাজনে 4টি নিউক্লিয়াস থেকে ৪টি নিউক্লিয়াস গঠিত হয় এবং ভ্রূণথলির দুই মেরুতে 4টি করে বিন্যস্ত হয়। প্রতি মেরুতে 4টি নিউক্লিয়াস একটি কোয়াড্রেট গঠন করে।

৫. এরপর প্রতিটি নিউক্লিয়াস কোয়াড্রেট হতে একটি করে নিউক্লিয়াস ভ্রূণথলির কেন্দ্রস্থলে চলে আসে এবং পরস্পর মিলিত হয়ে একটি ডিপ্লয়েড সেকেণ্ডারি নিউক্লিয়াস গঠন করে।

৬. ভ্রূণথলির ডিম্বকরন্ধ্রের দিকের মেরুতে বিদ্যমান 3টি নিউক্লিয়াস একত্রে মিলে গর্ভযন্ত্র বা ডিম্বযন্ত্র (egg apparatus) গঠন করে। গর্ভযন্ত্রের মাঝখানের নিউক্লিয়াসটি আকারে বড় ও স্বতন্ত্র হয়, একে ডিম্বাণু বা ওভাম (ovum) বলে। ডিম্বাণুর দুপার্শ্বে অবস্থিত দুটি নিউক্লিয়াসকে সিনারজিড (synergid) বা সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস বলে।

৭. ভ্রূণথলির ডিম্বকমূলের দিকের মেরুতে বিদ্যমান 3টি নিউক্লিয়াস সেলুলোজ প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে 3টি কোষে পরিণত হয়। এদের অ্যান্টিপোডাল বা প্রতিপাদ কোষসমষ্টি (antipodal cells) বলে।

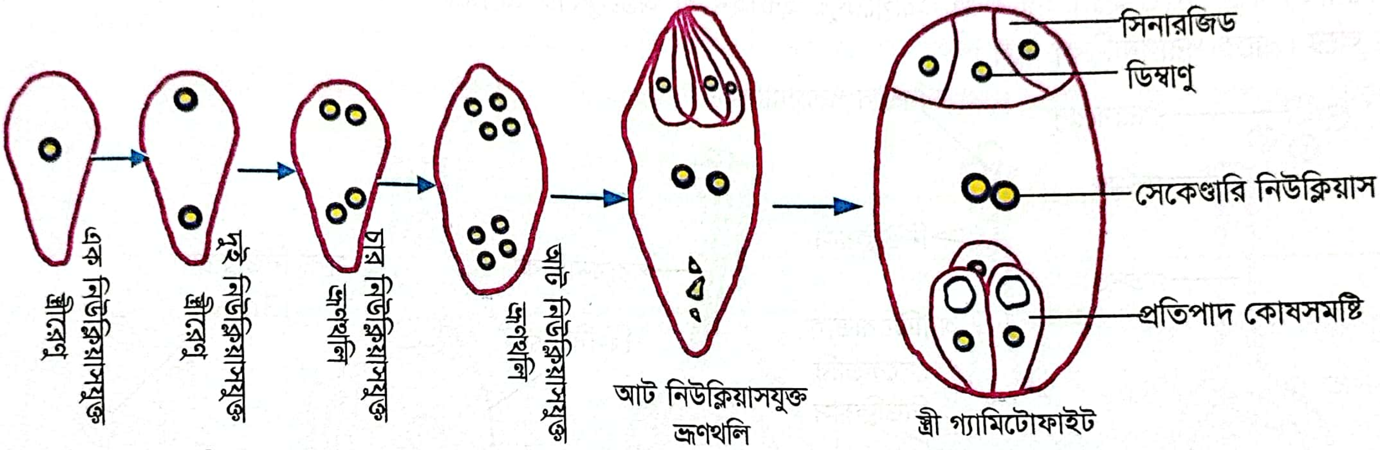

চিত্র ১০.৭ মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় স্ত্রী গ্যামিটোফাইট পরিস্ফুটনের বিভিন্ন ধাপ

এভাবে সৃষ্ট ভ্রূণথলি এবং এতে অবস্থিত ডিম্বাণু, সিনারজিড, সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ও প্রতিপাদ কোষসমষ্টিকে একত্রে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট বলা হয়।

৫। পরাগায়ণ (Pollination)

যে পদ্ধতিতে ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তাকে পরাগায়ণ বলে। উদ্ভিদ প্রজননের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া হলো পরাগায়ণ। সাধারণত বায়ু, মৌমাছি, প্রজাপতি, মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ, পাখি ইত্যাদি দ্বারা উদ্ভিদের পরাগায়ণ সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদে দুধরনের পরাগায়ণ হয়ে থাকে, যথা- স্বপরাগায়ণ ও পরপরাগায়ণ। যখন একই ফুলে বা একই প্রজাতির অভিন্ন গাছের দুটি ফুলের মধ্যে পরাগায়ণ সম্পন্ন হয় তখন তাকে **স্বপরাগায়ণ (self pollination)** বলে। সরিষা, ধুতুরা ইত্যাদি উদ্ভিদে স্ব পরাগায়ণ ঘটে। স্বপরাগায়নে দুটি ফুলের জিনোটাইপ একই রকম হয় তাই উৎপন্ন উদ্ভিদ মাতৃ উদ্ভিদের হুবহু গুণ সম্পন্ন হয় অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে প্রজাতির বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন থাকে বা রক্ষিত হয়। অন্যদিকে যখন একই প্রজাতির ভিন্ন গাছের দুটি ফুলের মধ্যে পরাগায়ণ সম্পন্ন হয় তখন তাকে **পরপরাগায়ণ (cross pollination)** বলে। শিমুল, পেঁপে ইত্যাদি উদ্ভিদে পরপরাগায়ণ ঘটে এক্ষেত্রে ফুলের জিনোটাইপ ভিন্ন রকম হওয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদ মাতৃ উদ্ভিদের হুবহু গুণ সম্পন্ন হয় না। ফলে পরবর্তী বংশধরদের মাঝে নতুন প্রকরণ উদ্ভব হতে পারে যা উদ্ভিদ বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬। নিষেক (Fertilization)

যৌন জননক্ষম জীবের দুটি অসম জননকোষ অর্থাৎ ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনকে নিষেক বা গর্ভাধান বলে। নিষেকে ফলে সৃষ্ট কোষকে জাইগোট (zygote) বলে। নিষেক একটি বিশেষ জৈবিক প্রক্রিয়া। উদ্ভিদের পরাগায়ণের প্রধা উদ্দেশ্যই হলো নিষেক এবং পরাগায়ণের পরবর্তীতে ফুলে নিষেক সাধিত হয়। এতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর হ্যাপ্লয়েড (n সংখ্যক ক্রোমোসোমবাহী প্রো-নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং জীবে

ক্রোমোসোম সংখ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। নিষেক ভ্রূণথলিতে বিদ্যমান নিষ্ক্রিয় ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে। নিষেক প্রজাতি নির্দিষ্ট (species specific) অর্থাৎ কেবল একই প্রজাতির ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মধ্যে নিষেক ঘটে। সকল আবৃতবীজী, ব্যক্তবীজী, ব্রায়োফাইটস, টেরিডোফাইটস এবং কিছু শৈবালে নিষেক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

নিষেক কৌশল

নিষেক একটি জটিল ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। স্ট্রাসবার্জার (Strassburger, 1884) আবৃতবীজী পুষ্পক উদ্ভিদে নিষেক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। আবৃতবীজী উদ্ভিদে নিম্নলিখিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষেক ক্রিয়া সংঘটিত হয়-

(১) **পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম:** একই প্রজাতির পুরুষ উদ্ভিদের পুংস্তবকের পরাগধানী হতে পরাগরেণু নির্গত হয়ে স্ত্রীস্তবকের উপযুক্ত গর্ভমুণ্ডে স্থাপিত হয় এবং অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরোদগমের প্রথমে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ড হতে তরল রস শোষণ করে স্ফীত হয়। এর ফলে পরাগরেণুর ইন্টাইন বা অন্তঃত্বকটি রেণুরন্ধ্র পথে নির্গত হয়ে নলাকৃতির নালিকা গঠন করে। একে পরাগনালিকা বলে।

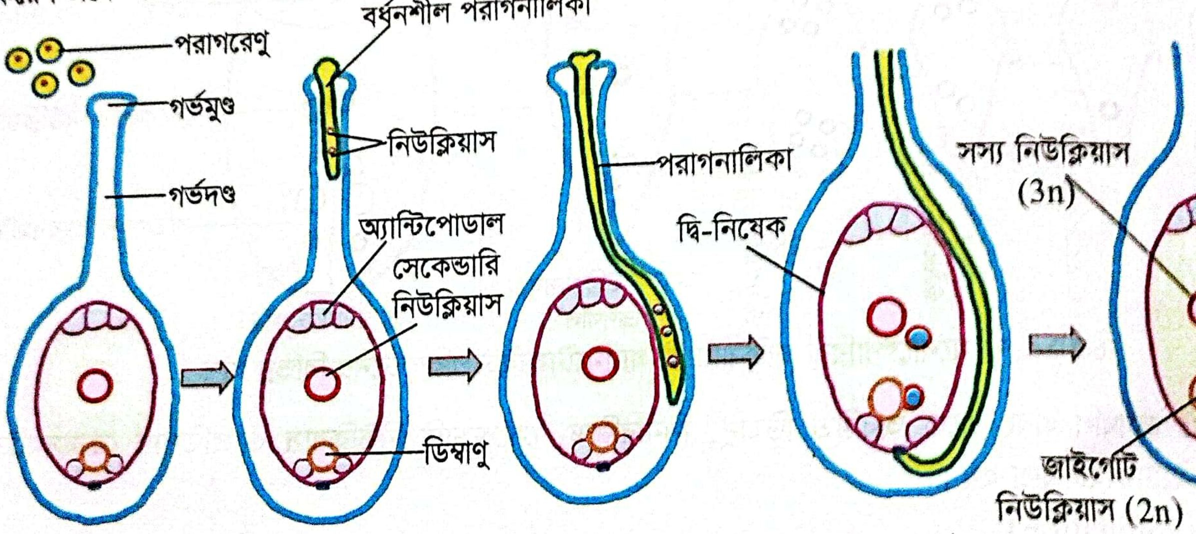

চিত্র ১০.৮ একটি আবৃতবীজী উদ্ভিদের নিষেক কৌশল

(২) **পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী বৃদ্ধি ও শুক্রাণু সৃষ্টি:** পরাগনালিকার অগ্রস্থ সাইটোপ্লাজমে দুটি শুক্রাণু বা পুংগ্যামিট এবং একটি নালি নিউক্লিয়াস থাকে। এগুলোসহ পরাগনালিকা ক্রমশ দীর্ঘায়িত হয়ে গর্ভমুণ্ড ও গর্ভদণ্ডের টিস্যু ভেদ করে গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌঁছায়। এক্ষেত্রে পরাগনালিকা কর্তৃক নিঃসৃত সেলুলেজ (cellulase) ও পেকটিনেজ (pectinase) এনজাইম গর্ভমুণ্ডের ভেতরের কোষ বিগলন করে অগ্রমুখী পরাগনালিকার গমন পথ সৃষ্টি করে।

এরপর পরাগনালিকাটি ডিম্বাশয়ে অবস্থিত ডিম্বকের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে এবং ডিম্বকরন্ধ্র বা ডিম্বকমূল দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে। পরাগনালিকা ডিম্বকরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করাকে পরোগ্যামি (porogamy) বলে। অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদে (যেমন-আম, জাম) পরোগ্যামি ঘটে। পরাগনালিকা ডিম্বকমূল দিয়ে প্রবেশ করাকে ক্যালজোগ্যামি (chalazogamy) বলে। কিছু সংখ্যক (যেমন-ঝাউ) উদ্ভিদে ক্যালজোগ্যামি ঘটে। কিউকারবেসি উদ্ভিদে (যেমন-লাউ ও কুমড়া) পরাগনালিকা ডিম্বক ত্বক ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে। একে মেসোগ্যামি (misogamy) বলে।

(৩) **পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণুর অবমুক্তি:** ডিম্বকের ভ্রূণপোষক টিস্যু ভেদ করে পরাগনালিকাটি ভ্রূণথলির প্রাচীর ভেদ করে পরিশেষে ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে এবং একটি সাহায্যকারী কোষের উপর দিয়ে ডিম্বাণুর নিকট পৌঁছায়। এসময় পরাগনালিকার প্রান্তভাগ বিদীর্ণ হয়ে উহার মধ্যস্থ পুংগ্যামিট দুটি ভ্রূণথলিতে মুক্ত হয়। পরাগনালিকার চাপে একটি বা দুটি সাহায্যকারী কোষ বিনষ্ট হয়ে যায়।

(৪) **ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন:** পরাগনালিকা হতে ভ্রূণথলিতে মুক্ত দুটি পুংগ্যামিটের একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড জাইগোট গঠনের মাধ্যমে নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। হ্যাপ্লয়েড পুংগ্যামিটের (n) সাথে

হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুর (n) এ ধরনের মিলনকে সিনগ্যামি (syngamy) বলে। ভ্রূণথলিতে মুক্ত অপর পুংগ্যামিটটি অধিকাংশক্ষেত্রে ভ্রূণথলিতে বিদ্যমান ডিপ্লয়েড (2n) সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে একটি ট্রিপ্লয়েড (3n) এন্ডোস্পার্মিক বা সস্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। ভ্রূণথলির ডিপ্লয়েড সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি হ্যাপ্লয়েড পুংগ্যামিটের মিলনকে ত্রৈধ মিলন বা ত্রিমিলন (triple fusion) বলে।

দ্বি-নিষেক ক্রিয়া (Double fertilization)

যখন পরাগনালিকার অন্তর্গত দুটি পুংগ্যামিটের একটি ভ্রূণথলির হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু এবং অপরটি ভ্রূণথলির ডিপ্লয়েড সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় তখন ঐরূপ দ্বৈত নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়াকে দ্বি-নিষেক বা দ্বিগর্ভাধান বলে। দ্বি-নিষেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রাশিয়ান বিজ্ঞানী সারজি নাওয়াসিন ও গ্রিগনার্ড (Sergei Nawaschin and Grignard) এবং ফরাসি বিজ্ঞানী লিওন গুইগনার্ড (Leon Guignard) প্রায় একশতক পুর্বে (1898) আবৃতবীজী উদ্ভিদে দ্বি-নিষেক ক্রিয়া আবিষ্কার করেন। নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে কেবল *Ephedra* ও *Gnetum* গণভূক্ত কয়েকটি প্রজাতির উদ্ভিদে দ্বি-নিষেক ক্রিয়া ঘটে। দ্বিনিষেক ক্রিয়া উদ্ভিদের বেঁচে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বীজে সস্য উৎপাদন করে।

নিষেক ও দ্বি-নিষেকের মধ্যে পার্থক্য

নিষেক	দ্বি-নিষেক
১। একই সময়ে একটি পুংগ্যামিট ও একটি স্ত্রীগ্যামিটের মিলনকে নিষেক বলে।	২। একই সময়ে একটি ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে দ্বি-নিষেক বলে।
২। সকল সপুষ্পক উদ্ভিদে ঘটে।	২। কেবল পুষ্পক আবৃতবীজী উদ্ভিদে ঘটে।
৩। এক্ষেত্রে 1টি পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয়।	৩। এক্ষেত্রে 2টি পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয়।
৪। নিষেকের ফলে কেবল ভ্রূণ সৃষ্টি হয়।	৪। দ্বিনিষেকের ফলে ভ্রূণ ও সস্য সৃষ্টি হয়।

নিষেকের গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of fertilization)

নিষেক ঘটনাটি যৌন জননকারী উদ্ভিদদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিষেকের ফলে জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। বংশগতি ও জিনতাত্ত্বিক দিক থেকে নিষেকের গুরুত্ব অপরিসীম। নিষেকের কয়েকটি মৌলিক তাৎপর্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। **ক্রোমোসোম সংখ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা:** নিষেকে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুর (n) সাথে হ্যাপ্লয়েড পুংগ্যামিট (n) মিলিত হয়ে জীবের ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোসোম সংখ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

২। **ফল ও বীজ সৃষ্টি:** নিষেকের ফলে ডিম্বাণু পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়। এর পরিণতিতে ফুলের গর্ভাশয় ফলে এবং এর ডিম্বকগুলো বীজে পরিণত হয়।

৩। **উদ্ভিদের বংশ রক্ষা ও বিস্তার:** নিষেকের ফলে উদ্ভিদের ফল ও বীজ সৃষ্টি হয়। ফল ও বীজ পুষ্পক উদ্ভিদের বংশ রক্ষার্থে অত্যাবশ্যক। নিষেক জীবের বংশ রক্ষার ও ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। প্রাণী, পানি কিংবা বায়ু দ্বারা ফল ও বীজ দূরবর্তী স্থানে বাহিত হয়ে উদ্ভিদের বিস্তার ঘটায়।

৪। **খাদ্যের উৎস:** নিষেকের ফলে সৃষ্ট ফল ও বীজ মানুষসহ অনেক প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে উদ্ভিদের নিষেকক্রিয়া মানুষসহ সকল প্রাণীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শস্য, ডাল, সবজি, ফল ইত্যাদি সকল ধরণের খাদ্যই উদ্ভিদের নিষেক ক্রিয়ার ফল।

৫। **বিবর্তন ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি:** নিষেকের ফলে জাইগোটে জিনের পুনঃসমন্বয় ঘটে এবং এতে জীবে প্রকরণের সূচনা হয় যা বিবর্তন ও নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৭। ভ্রূণের পরিস্ফুটন (Embryonic development)

নিষেক ভ্রূণথলিতে বিদ্যমান নিষ্ক্রিয় ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে। নিষেকের ফলে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুর (n) সাথে হ্যাপ্লয়েড পুংগ্যামিটের (n) মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়েড কোষ (2n) সৃষ্টি হয় তাকে জাইগোট বা উওস্পোর (zygote or oospore) বলে। এ জাইগোটই হলো স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদের প্রথম কোষ। জাইগোটের চারপাশে একটি আবরণ তৈরি করে কিছু সময় সুপ্তাবস্থায় কাটায়। উদ্ভিদের প্রজাতিভেদে এ সুপ্তিকাল ভিন্ন হয়। সুপ্তিকালের পর ডিপ্লয়েড জাইগোটটি মাইটোসিস বিভাজন ও ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জাইগোটটি বিভাজিত হয়ে প্রথমে দুটি কোষে পরিণত হয়। এদুটি কোষের মধ্যে ভ্রূণথলির কেন্দ্রের দিকে বিন্যস্ত কোষটিকে প্রান্তকোষ বা শীর্ষকোষ (apical cell) বলে এবং ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে বিন্যস্ত কোষটিকে ভিত্তিকোষ (basal cell) বলে। পরবর্তীতে ধারাবাহিক বিভাজনের মাধ্যমে প্রান্তকোষটি ভ্রূণ (embryo) এবং ভিত্তিকোষটি ভ্রূণধারক (suspensor)-এ পরিণত হয়।

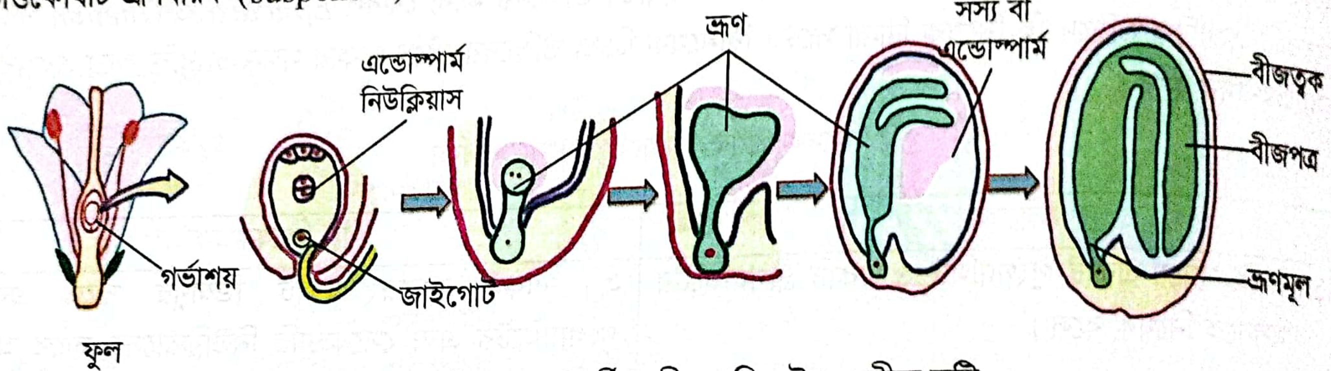

চিত্র ১০.৯ নিষেক পরবর্তী ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন ও বীজ সৃষ্টি

❑ সস্যের সৃষ্টি (Formation of endosperm): নিষেকের সময় সৃষ্ট ট্রিপ্লয়েড সস্য নিউক্লিয়াসটি অবাধ বিভাজন দ্বারা 3n সংখ্যক ক্রোমোসোম বিশিষ্ট সস্য বা এন্ডোস্পার্ম গঠন করে। আবৃতবীজী উদ্ভিদের ডিম্বকে ভ্রূণথলির মধ্যে ভ্রূণ ও সস্যের যুগপৎ পরিস্ফুটন ঘটে। পরিস্ফুটনরত ভ্রূণটি সস্যকলা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং এ সস্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভ্রূণের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে লিপিড, প্রোটিন ও স্টার্চ জমা থাকে।

❑ বীজ ও ফল সৃষ্টি (Formation of seed and fruit):: ডিম্বকের অন্তর্গত ভ্রূণথলিতে যখন ভ্রূণের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুটন ঘটতে থাকে তখন ডিম্বকটি বীজে এবং এক বা একাধিক ডিম্বকসহ গর্ভাশয়টি ক্রমশ বর্ধিত হয়ে ফলে পরিণত হয়। বীজের অভ্যন্তরে পূর্ণ বিকশিত ভ্রূণটি বীজপত্র, ভ্রূণমূল ও ভ্রূণকাণ্ড নিয়ে গঠিত থাকে। ভ্রূণ বিকাশের সময় সস্য হতে উহা পুষ্টি লাভ করে। বিকাশরত ভ্রূণ দ্বারা বীজের সস্য সম্পূর্ণরূপে শোষিত হলে সে বীজটি সস্যবিহীন হয় এবং এরূপ বীজকে অসস্যল বীজ (non-endospermic seed) বলে। মটর (*Pisum sativum*), শিম (*Phaselous vulgaris*), আম (*Mangifera indica*), কাঁঠাল (*Artocapus heterophyllus*), সরিষা (*Brassica napus*), সূর্যমুখী (*Helianthus annuus*) ইত্যাদি অসস্যল বীজ। অন্যদিকে বীজে যদি সস্যের কিছু অংশ বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে সস্যল বীজ (endospermic seed) বলে। ধান (*Oryza sativa*), ভুট্টা (*Zea mays*), গম (*Tricum aestivum*), তুলা (*Gossypium herbaceum*) ইত্যাদি সস্যল বীজ। অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদের বীজের ভ্রূণপোষক টিস্যু বা নিউসেলাস ভ্রূণ কর্তৃক শোষিত হয়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্রূণপোষক টিস্যু পরিভ্রূণ বা পেরিস্পার্ম হিসেবে সস্যের বাইরে থেকে যায়।

নিষেকের পর ডিম্বকের নরম ও রসালো ত্বক দুটি কঠিন ও শুষ্ক বীজত্বকে এবং ডিম্বকবৃন্ত বীজবৃন্তে পরিণত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিম্বকবৃন্তটি উপবৃদ্ধিরূপে উদ্ভূত হয়ে বীজের চারদিকে একটি অতিরিক্ত রসালো ত্বকরূপে অবস্থান করে। এরূপ রসালো অতিরিক্ত ত্বককে এরিল (aril) বলে। লিচু (*Litchi chinensis*) ও আঁশফলে এরূপ এরিল দেখা যায়। লিচুর এরিলকে আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি।

ডিম্বক হতে বীজে পরিবর্তন	
ডিম্বক	বীজ
ডিম্বকত্বক	বীজত্বক
নিষিক্ত ডিম্বাণু	ভ্রূণ
এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস	এন্ডোস্পার্ম
ডিম্বকরন্ধ্র	বীজরন্ধ্র
ডিম্বকনাভি	বীজনাভি
ডিম্বকবৃন্ত	বীজবৃন্ত
ভ্রূণপোষক টিস্যু	নিঃশেষ হয়ে যায়
প্রতিপাদ কোষ	বিনষ্ট হয়ে যায়
সাহায্যকারী কোষ	বিনষ্ট হয়ে যায়

নিষেকের পর গর্ভাশয় (ডিম্বাশয়) এবং ডিম্বকের পরিবর্তন	
নিষেক পূর্ববর্তী অবস্থা	নিষেক পরবর্তী অবস্থা
গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়	ফল
গর্ভাশয় ত্বক	ফল ত্বক
ডিম্বক	বীজ
ডিম্বক বহিঃত্বক বা এক্সাইন	বীজ বহিঃত্বক বা টেস্টা
ডিম্বক অন্তঃত্বক বা ইন্টাইন	বীজ অন্তঃত্বক বা টেগমেন
ডিম্বক মূল বা ক্যালাজা	বীজবৃন্ত বা বিনষ্ট হয়ে যায়
ডিম্বকরন্ধ্র	বীজরন্ধ্র
ডিম্বক নাভি	বীজ নাভি
নিউসেলাস টিস্যু	পেরিস্পার্ম বা বিনষ্ট হয়ে যায়
সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস	সস্য
ডিম্বাণু (নিষিক্ত)	ভ্রূণ
সাহায্যকারী কোষ	বিনষ্ট হয়ে যায়
প্রতিপাদ কোষ	বিনষ্ট হয়ে যায়

উদ্ভিদের অযৌন জনন (Asexual reproduction in plant)

গ্যামিটের (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) মিলন ছাড়া উদ্ভিদের যে প্রজনন ঘটে তাকে অযৌন জনন বলে।

অযৌন প্রজননের বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব

১। অযৌন প্রজননে জনন অঙ্গের বিকাশ ঘটে না, গ্যামিট সৃষ্টি হয় না।

২। এটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

৩। এক্ষেত্রে জীবনচক্র কিংবা জনুক্রমের সূচনা ঘটে না।

৪। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদে কোনো বৈচিত্র্য আসে না।

৫। এক্ষেত্রে উদ্ভিদ কোনো জটিল দশা অতিক্রম করে না।

৬। এ প্রজননে একসাথে বহু সংখ্যক উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় এবং উদ্ভিদের জীবনকাল ক্ষণস্থায়ী হয়।

৭। উদ্ভিদে দ্রুত ফল সৃষ্টি হয়।

৮। অধিকাংশ নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে অযৌন জনন ঘটে।

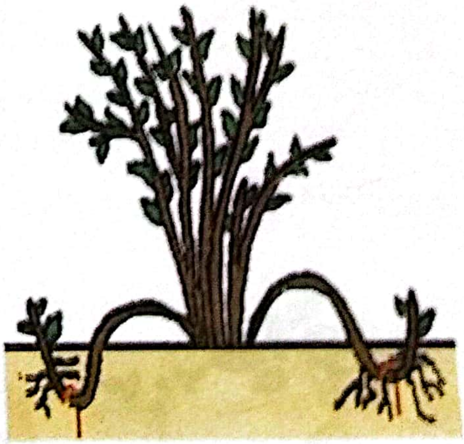

চিত্র ১০.১০ উদ্ভিদের অযৌন জনন

উদ্ভিদে প্রধান দুভাবে অযৌন প্রজনন সংঘটিত হয়, যথা-

(ক) স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে জনন: শৈবাল, ছত্রাক, মস, ফার্ন ইত্যাদি নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন ঘটে। এক্ষেত্রে দেহে যে জননাঙ্গের সৃষ্টি হয় তাকে স্পোরাঞ্জিয়াম (sporangium) বলে। স্পোর সচল বা অচল প্রকৃতির হতে পারে। সচল প্রকৃতির স্পোরকে জুওস্পোর (zoospore) বলা হয়। শৈবাল ও ছত্রাকে জুওস্পোর সৃষ্টি হয়। নগ্ন, সচল, ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত জ্যুওস্পোর, ফ্ল্যাজেলাবিহীন ও নিশ্চল প্রকৃতির অ্যাপ্ল্যানোস্পোর, সঞ্চিত খাদ্য সমন্বিত এবং স্থূল ও দৃঢ় প্রাচীরবিশিষ্ট হিপনোস্পোর দ্বারা শৈবালের অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। কনিডিয়া (*Penicillium, Aspergillus*), জ্যুওস্পোর (*Saprolegnia*), অ্যাপ্ল্যানোস্পোর (*Mucor, Rhizopus*), ক্ল্যামাইডোস্পোর (*Mucor, Fusarium*), বেসিডিওস্পোর (*Agaricus, Puccinia*) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের স্পোর দ্বারা ছত্রাকে অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। ফার্ন উদ্ভিদের ক্যাপস্যুলে স্পোর সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে প্রোথ্যালাস সৃষ্টি করে। প্রোথ্যালাস যৌন প্রজননে অংশগ্রহণ করে।

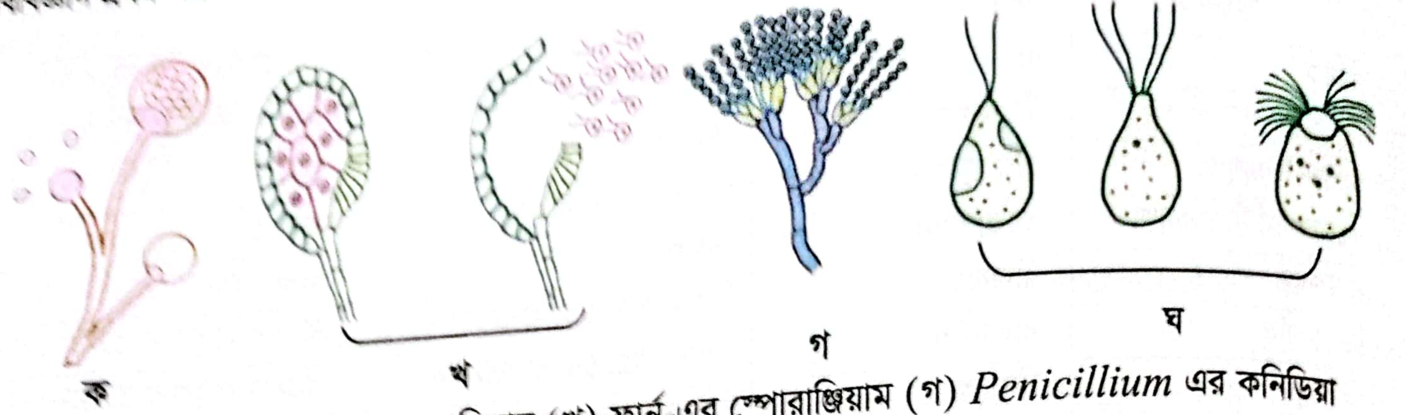

চিত্র ১০.১১ (ক) ছত্রাক -এর স্পোরাঞ্জিয়াম (খ) ফার্ন-এর স্পোরাঞ্জিয়াম (গ) *Penicillium* এর কনিডিয়া এবং (ঘ) শৈবালের বিভিন্ন ধরনের স্পোর

(খ) অঙ্গজ জননের মাধ্যমে: উদ্ভিদ দেহের যে কোনো অঙ্গের মাধ্যমে অঙ্গজ জনন হয়ে থাকে। এটি উদ্ভিদের সাধারণ প্রজনন পদ্ধতি। দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ হতে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। অঙ্গজ জনন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে।

❑ প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন: বেশ কয়েকটি উপায়ে উদ্ভিদের প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন ঘটে, যেমন-

১। খণ্ডক দ্বারা (By fragments): নিম্নশ্রেণির কিছু উদ্ভিদ যেমন, *Spirogyra, Oscillatoria* প্রভৃতি উদ্ভিদের দেহ কোনো কারণে ভেঙ্গে গিয়ে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রতিটি খণ্ড থেকে পরবর্তীতে কোষ বিভাজন দ্বারা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ সৃষ্ট হয়।

চিত্র ১০.১২ কয়েকটি উদ্ভিদের প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন

২। কুঁড়ি সৃষ্টি দ্বারা (By budding): ঈস্টে মুকুল বা কুঁড়ি সৃষ্টি দ্বারা অঙ্গজ জনন ঘটে। এক্ষেত্রে ঈস্ট কোষের একাংশ ফোলে উঠে এবং এর নিউক্লিয়াস দুভাগে বিভাজিত হয়। বিভাজিত নিউক্লিয়াসের এক অংশ ফোলা অংশে প্রবেশ করে এবং অন্য অংশ মাতৃদেহে থেকে যায়। নিউক্লিয়াসসহ ফোলা অংশটি একসময় মাতৃদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ঈস্টের জন্ম দেয়।

৩। ভূনিম্নস্থ কাণ্ড দ্বারা (By underground stems): কিছু উদ্ভিদ যেমন- আদা, হলুদ, গোলআলু, ওলকচু, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদির ভূনিম্নস্থ কাণ্ড হতে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়।

৪। রূপান্তরিত মূল দ্বারা (By modified roots): মিষ্টি আলু, কাঁকরোল, ডালিয়া, পটল ইত্যাদি উদ্ভিদের রূপান্তরিত মূল থেকে নির্দিষ্ট ঋতুতে নতুন চারা গজায়।

৫। অর্ধবায়বীয় কাণ্ড বা স্টোলন দ্বারা (By stolons): কলা, পুদিনা, আমরুল, বাঁশ, আনারস, চন্দ্রমল্লিকা, কচু, স্ট্রবেরি ইত্যাদি উদ্ভিদের অর্ধবায়বীয় কাণ্ড বা স্টোলন হতে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

৬। পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্ল্যাড দ্বারা (By phylloclades): ফনিমনসাসহ অনেক উদ্ভিদের রূপান্তরিত পাতা বা ফাইলোক্ল্যাড হতে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

৭। পাতা দ্বারা (By leaves): পাথরকুচি উদ্ভিদের পাতা থেকে নতুন চারা গজায়।

❑ কৃত্রিম অঙ্গজ জনন: মাতৃ উদ্ভিদের ফুল ও ফলের গুণগত মান বজায় রেখে উদ্ভিদের কাণ্ড বা অন্য যে কোনো অংশ থেকে কৃত্রিমভাবে চারা উৎপাদন করার পদ্ধতিকে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন বলে। সাধারণত কলম তৈরি এবং আধুনিক টিস্যু কালচারের মাধ্যমে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন ঘটানো হয়ে থাকে। উদ্ভিদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৃত্রিম অঙ্গজ জনন হলো:

১। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে (Tissue culture): এটি একটি আধুনিক জৈব প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে কলা, স্ট্রবেরি, বেল, চন্দ্রমল্লিকা, আলু ইত্যাদি উদ্ভিদের চারা বাণিজ্যিকভাকে উৎপাদন করা হয়।

২। শাখা কলম বা কাটিং (Cutting): কোনো কোনো উদ্ভিদের পরিণত কাণ্ডের অংশ বিশেষ কেটে ভেজা মাটিতে পুঁতে রাখলে তা থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়। যেমন-জবা, গোলাপ, আখ ইত্যাদি।

চিত্র ১০.১৩ কয়েকটি উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ জনন

৩। দাবা কলম (Layering): অনেক উদ্ভিদ যেমন, লেবু, যুঁই ইত্যাদির মাটি সংলগ্ন লম্বা কাণ্ডকে বাঁকিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখলে সেখান থেকে নতুন চারা গজায়।

৪। জোড় কলম (Grafting): উন্নত উদ্ভিদের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য জোড় কলম তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচিত উদ্ভিদের একটি শাখা একই প্রজাতির অন্য একটি স্থায়ী উদ্ভিদের শাখার সাথে যুক্ত করা হয়। নির্বাচিত উদ্ভিদের শাখাকে সিয়ন (scion) এবং স্থায়ী উদ্ভিদকে স্টক (stock) বলে। সিয়ন শাখাটি বিকশিত হওয়া শুরু করলে স্টকের শাখাটি উপরের দিক থেকে কেটে ফেলা হয়। এ পদ্ধতিতে উন্নত জাতের কুল, আম ইত্যাদি উদ্ভিদের জনন ঘটানো হয়।

৫। গুটি কলম (Gootee): গুটি কলম একটি প্রাচীন পদ্ধতি। শক্ত কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ যেমন- লিচু, লেবু, লটকন, আম ইত্যাদিতে গুটি কলম দেয়া হয়। এক্ষেত্রে উদ্ভিদের একটি সরু কাণ্ডের 2-3 ইঞ্চির বাকল তুলে ফেলা হয়। সেখানে গোবর মিশ্রিত মাটির প্রলেপ দিয়ে কাপড় বা খড় দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। এরপর নিয়মিত পানি দিতে থাকলে সেখানে অস্থানিক মূল গজায়। মূলসহ উদ্ভিদের শাখাটি বিচ্ছিন্ন করে অন্যত্র আর্দ্র মাটিতে রোপন করলে সেখানে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।

কৃত্রিম অঙ্গজ জননের গুরুত্ব

১। এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারাতে মাতৃ গাছের গুণাগুণ বজায় থাকে।
২। এ পদ্ধতিতে অল্প সময়ে অনেক বেশি চারা উৎপাদন করা যায়।
৩। যেসব উদ্ভিদের বীজ থেকে চারা উৎপাদনে সমস্যা থাকে সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এপদ্ধতি সুবিধাজনক।
৪। সৃষ্ট উদ্ভিদ থেকে দ্রুত ফল লাভ করা যায়।

৫। কৃত্রিম অঙ্গজ জনন দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করে অনেক নার্সারিতে বহুলোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

উদ্ভিদের অযৌন ও যৌন জননের মধ্যে পার্থক্য

অযৌন জনন	যৌন জনন
১। জনন অঙ্গের বিকাশ ঘটে না, গ্যামিট সৃষ্টি হয় না।	১। জনন অঙ্গের বিকাশ ঘটে, গ্যামিট সৃষ্টি হয়।
২। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।	২। মাইটোসিস ও মায়োসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।
৩। জীবনচক্র কিংবা জনুক্রমের সূচনা ঘটে না।	৩। জীবনচক্র কিংবা জনুক্রমের সূচনা ঘটে।
৪। সৃষ্ট উদ্ভিদে কোনো বৈচিত্র্য আসে না।	৪। সৃষ্ট উদ্ভিদে প্রকরণ সৃষ্টি হয় ফলে বৈচিত্র্য আসে।
৫। কোনো জটিল দশা অতিক্রম করে না।	৫। একাধিক জটিল দশা অতিক্রম করে।
৬। একসাথে বহু সংখ্যক উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।	৬। এক সাথে অল্প সংখ্যক উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।
৭। উদ্ভিদের জীবনকাল ক্ষণস্থায়ী হয়।	৭। উদ্ভিদের জীবনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়।
৮। উদ্ভিদে দ্রুত ফল সৃষ্টি হয়।	৮। উদ্ভিদে বিলম্বে ফল সৃষ্টি হয়।
৯। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে অযৌন জনন ঘটে।	৯। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে যৌন জনন ঘটে।

❑ অপুংজনি বা পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis)

যৌন জননক্ষম উদ্ভিদে সাধারণত দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামিটের (ডিম্বাণু ও শুক্রাণু) মিলনে সৃষ্ট জাইগোটের মাধ্যমে প্রজনন ঘটে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো উদ্ভিদের অনিষিক্ত ডিম্বাণু বিকশিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ জন্ম দেয়। অনিষিক্ত ডিম্বাণু হতে ভ্রূণ তথা নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে পার্থেনোজেনেসিস বা অপুংজনি (**parthenogenesis; Gr. *parthenos*=virgin and *genesis*=origin**) বলে। [হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পারথেনোকার্পি (Parthenocarpy) বলে। যেমন কমলা লেবু, লেবু ইত্যাদি।]

প্রকার: উদ্ভিদে দুধরণের পার্থেনোজেনেসিস ঘটে, যথা-

১। হ্যাপ্লয়েড বা আর্হিনোটোকাস পার্থেনোজেনেসিস (Haploid or arrhenotochous parthenogenesis): অনিষিক্ত হ্যাপ্লয়েড গ্যামিট (n) থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্ভিদ সৃষ্টি হলে তাকে হ্যাপ্লয়েড বা আর্হিনোটোকাস পার্থেনোজেনেসিস বলে। *Solanum nigram, Orchis maculata* উদ্ভিদে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুতে পার্থেনোজেনেসিস দেখা যায়। তামাক উদ্ভিদে হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণুতে পার্থেনোজেনেসিস ঘটে। এধরনের প্রজননকে অ্যান্ড্রোজেনেসিস (androgenesis) বলে।

২। ডিপ্লয়েড বা থেলিটোকাস পার্থেনোজেনেসিস (Diploid or thelytochous parthenogenesis): ক্রটিপূর্ণ মায়োসিসে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড ডিম্বাণুর (2n) মাধ্যমে উদ্ভিদ সৃষ্টি হলে তাকে ডিপ্লয়েড বা থেলিটোকাস পার্থেনোজেনেসিস বলে। *Parthenium, Antennaria* প্রভৃতি উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস দেখা যায়।

কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস (Artificial parthenogenesis)

যেসব ডিম্বাণু বা ডিম থেকে নিষেক প্রক্রিয়ার পর অপত্য জীব সৃষ্টি হয় সেসব ডিম্বাণু বা ডিম থেকে নিষেকের পূর্বে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস পদ্ধতির মাধ্যমে পরিস্ফুটন ঘটিয়ে অপত্য জনু সৃষ্টি করা যায়। যে পদ্ধতিতে এ ঘটনা ঘটানো হয় তাকে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস বলে। জীবে সাধারণত দুভাবে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো হয়ে থাকে। যথা-

(ক) ভৌত পদ্ধতি: নিম্নলিখিত উপায়সমূহ দ্বারা ভৌতভাবে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস ঘটে-

- তাপমাত্রার বিস্তর পরিবর্তন দ্বারা কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়। অনেকক্ষেত্রে অনিষিক্ত ডিম্বাণুকে 30°C তাপমাত্রা হতে 0C-10°C তাপমাত্রায় স্থানান্তর করলে পার্থেনোজেনেসিস ঘটে যায়।

- বৈদ্যুতিক শকের মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়।
- অতি বেগুনি রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়।
- ডিম্বাণুকে অতি সূক্ষ্ম কাঁচের সুঁই দ্বারা খোঁচালে পার্থেনোজেনেসিস ঘটে।

(খ) রাসায়নিক পদ্ধতি: স্বাভাবিক অনিষিক্ত ডিম্বাণু কিছু রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ভ্রূণ সৃষ্টি করে। পার্থেনোজেনেসিস সংঘটনকারী কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ হলো: ক্লোরোফর্ম, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, বিউটারিক অ্যাসিড, অলিক অ্যাসিড, টলুইন, বেনজিন, অ্যাসিটোন, ইউরিয়া, সুক্রোজ ইত্যাদি।

পার্থেনোজেনেসিসের গুরুত্ব

১। অনেক জীবে পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, যেমন-মৌমাছি, বোলতা।

২। এ প্রক্রিয়া বংশগতিয় ক্রোমোসোম তত্ত্বকে সমর্থন করে।

৩। এ প্রক্রিয়া জীবের একটি অতি সরল, স্থায়ী ও সহজ প্রজনন প্রক্রিয়া।

৪। পার্থেনোজেনেসিস জীবগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রকরণবিহীন করে।

৫। কোনো কোনো পতঙ্গের ক্ষেত্রে পার্থেনোজেনেসিস ঘটে বলে অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে, যেমন-অ্যাফিড।

৬। পার্থেনোজেনেসিস জীবে পলিপ্লয়েড অবস্থা সৃষ্টি করে।

৭। পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়া জীবের সুবিধাজনক মিউটেন্ট বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিকাশে উৎসাহিত করে।

৮। পার্থেনোজেনেসিস প্রজাতিকে বন্ধ্যাত্ব হতে রক্ষা করে।

❑ অ্যাপোস্পোরি (Apospory): উদ্ভিদের কোনো সোমাটিক কোষ বা দেহকোষ সরাসরি গ্যামিটোফাইটে পরিণত হলে তাকে অ্যাপোস্পোরি বলা হয়। গর্ভাশয়ের যে কোনো কোষ ডিপ্লয়েড গ্যামিটোফাইট (2n) হিসেবে কাজ করে সক্রিয় ভ্রূণসহ বীজ উৎপাদন করতে পারে। এসব বীজ থেকে মাতৃ উদ্ভিদের অনুরূপ গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। *Hieracium* উদ্ভিদে অ্যাপোস্পোরি দেখা যায়।

❑ অ্যাপোগ্যামি (Apogamy): ডিম্বাণু ব্যতিত ভ্রূণথলির অন্য যে কোনো কোষ থেকে ভ্রূণসৃষ্টির মাধ্যমে কার্যক্ষম বীজ উৎপন্ন হলে তাকে অ্যাপোগ্যামি বলে। অনেক ফার্ন উদ্ভিদে অ্যাপোগ্যামি হয়।

❑ অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি (adventitive embryony: ডিম্বকের যে কোনো কোষ হতে ভ্রূণথলি গঠন ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি বলে।

❑ অ্যাগ্যামোস্পার্মি (agamospermy): নিষেক ছাড়া ডিম্বাণু, ভ্রূণথলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে ভ্রূণ তৈরির প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে অ্যাগ্যামোস্পার্মি বলে।

আবৃতবীজী উদ্ভিদে জনুক্রম (Alternation of generation in Angiosperm)

কোনো উদ্ভিদের জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড গ্যামিটোফাইটিক জনু (n) এবং ডিপ্লয়েড স্পোরোফাইটিক জনু (2n) পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হলে তাকে জনুঃক্রম বা অল্টারনেশন অব জেনারেশন বলে। ফার্ন ও মস জাতীয় উদ্ভিদের জীবনচক্রে জনুঃক্রম একটি স্বাভাবিক ঘটনা। আবৃতবীজী সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনচক্রে অসমপ্রকৃতির জনুঃক্রম পরিলক্ষিত হয়। এখানে গ্যামিটোফাইটিক পর্যায় (n) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পোরোফাইটিক পর্যায় (2n) দীর্ঘ।

গ্যামিটোফাইটিক পর্যায় (n): ভ্রূণথলি এবং এতে অবস্থিত ডিম্বাণু, সিনারজিড, সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ও প্রতিপাদ কোষসমষ্টিকে একত্রে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট বলা হয়। স্ত্রী গ্যামিটোফাইট থেকে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে শুক্রাণুসহ পরাগ নালিকা এবং পরাগরেণুকে একত্রে পুংগ্যামিটোফাইট বলে। পুংগ্যামিটোফাইট থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। এরা উভয়ই হ্যাপ্লয়েড (n) ধরনের।

স্পোরোফাইটিক পর্যায় (2n): নিষেক প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে জাইগোট গঠিত হয়। ডিপ্লয়েড জাইগোট (2n) স্পোরোফাইটিক পর্যায়ের প্রথম অবস্থা এটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি উদ্ভিদ গঠন করে। অঙ্গজ জননের মাধ্যমে যে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় তাতে ক্রোমোসোম সংখ্যার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদের ডিপ্লয়েড স্পোরোফাইটক পর্যায় যৌন জননের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু ও শুক্রাণ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে গ্যামিটোফাইটিক পর্যায় কোনো স্বতন্ত্র উদ্ভিদ সৃষ্টি করে না, উহা স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদের উপর সাময়িক পরবাসী। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে আবৃতবীজী উদ্ভিদের জনুঃক্রম ব্যাখ্যা করা হলো-

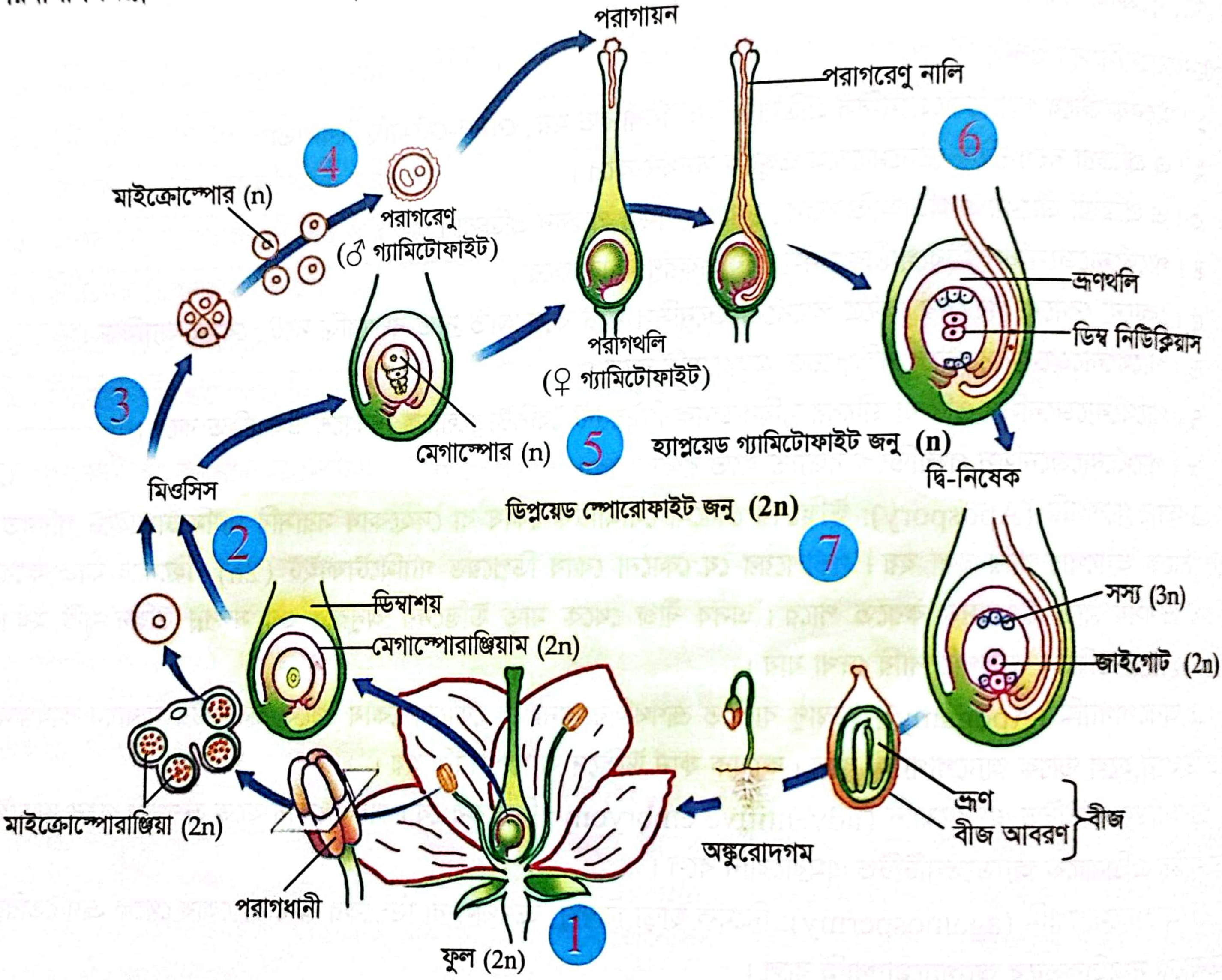

চিত্রঃ ১০.১৪ আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে জনুঃক্রম

১০.২ উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন (Artificial reproduction of plants)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য সমস্যা বিশ্বে এখন প্রধান সমস্যা। অধিক জনসংখ্যার জন্য খাদ্যোৎপাদন বিজ্ঞানীদের নিকট একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আর এ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে মানবজাতি চরম সংকটে পড়বে। উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদ সৃষ্টি করার মাধ্যমেই কেবল মানবজাতির খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যায়। আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি করা যায়। নির্বাচন (selection), সংকরায়ণ (hybridization), পরিব্যক্তি (mutation) ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদের উন্নত জাত সৃষ্টি করা যায়। তবে অধিকাংশক্ষেত্রে কৃত্রিম সংকরায়ণ প্রক্রিয়াতে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন ঘটানো হয়ে থাকে। অধিক ফলনশীল উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রকরণ বা জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে যে প্রক্রিয়ায় দুটি ভিন্ন জেনেটিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদের মধ্যে প্রজনন (ক্রস) ঘটানো হয় তাকে কৃত্রিম সংকরায়ণ বলে।

কৃত্রিম সংকরায়ণ প্রক্রিয়া

কতগুলো ধারাবাহিক নিয়মতান্ত্রিক ধাপে কৃত্রিম সংকরায়ণ বা হাইব্রিডাইজেশন সম্পন্ন হয়। নিম্নে কৃত্রিম সংকরায়ণের ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো-

১। প্যারেন্ট নির্বাচন (Parent selection): যেসব উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানো হবে তাদের সুস্থ ও সবল পুং ও স্ত্রী প্রকরণ নির্বাচন করাই হলো কৃত্রিম সংকরায়ণের প্রথম কাজ।

২। প্যারেন্টের কৃত্রিম স্বপরাগায়ণ (Artificial selfing): উদ্ভিদ পরপরাগী হলে কৃত্রিমভাবে স্বপরাগায়ণ ঘটানো হয়। এতে অনাকাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে না এবং উদ্ভিদ হোমোজাইগাস হয়।

৩। মাতৃ উদ্ভিদের ইমাস্কুলেশন (Emasculation of female parent): পুষ্প উভলিঙ্গ হলে স্বপরাগায়ণ রোধের জন্য তা থেকে পুংস্তবকের অপসারণ করতে হয়। পুষ্প থেকে পুংস্তবক অপসারণ করার পদ্ধতিকে ইমাস্কুলেশন বলে। একলিঙ্গ কিংবা পরপরাগী উদ্ভিদের ইমাস্কুলেশন প্রয়োজন হয় না। পুষ্প পরিণত হওয়ার পূর্বেই নরম ও ছোট চিমটার সাহায্যে সতর্কতার সাথে পুষ্প হতে পুংকেশরগুলো অপসারণ করতে হয়। লক্ষ রাখতে হবে এসময় যাতে গর্ভকেশর ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

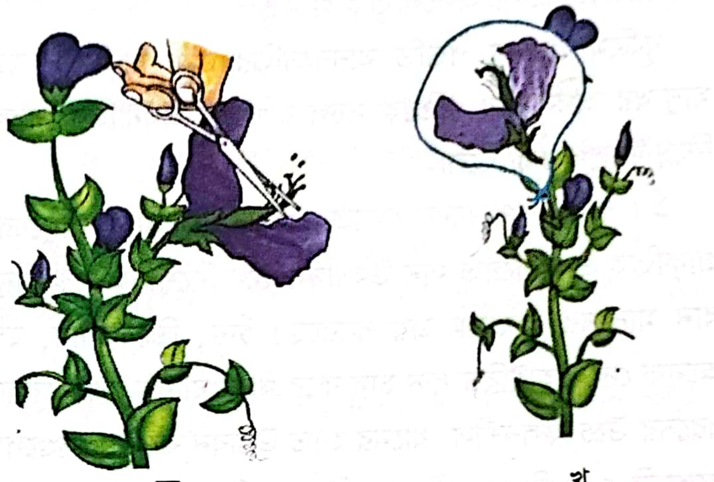

চিত্র ১০.১৫ কৃত্রিম প্রজননে উদ্ভিদের (ক) ইমাস্কুলেশন ও (খ) ব্যাগিং

৪। ব্যাগিং (Bagging): ক্রসের জন্য নির্বাচিত পুং ও স্ত্রী উদ্ভিদের পুষ্পিত অংশকে কাণ্ডসহ পাতলা পলিথিন ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এতে পরপরাগায়ণ ও জীবাণুর সংক্রমণ রোধ হয়।

৫। ক্রসিং (Crossing): ব্যাগিং করা পুং উদ্ভিদ হতে পুংরেণু ক্ষুদ্র ও নরম তুলির সাহায্যে সংগ্রহ করে ব্যাগিং করা স্ত্রী উদ্ভিদের ইমাস্কুলেটেড পুষ্পের গর্ভমুণ্ডের উপর স্থাপন করা হয়। একে ক্রসিং বলে।

৬। লেবেলিং (Lebelling): ইমাস্কুলেশনের তারিখ, ক্রসিং এর তারিখ, পিতৃ ও মাতৃ উদ্ভিদ পরিচিতি সমন্বিত একটি লেমিনেটেড লেবেল স্ত্রী উদ্ভিদের গায়ে আটকে দিতে হয়।

৭। বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (Collection and preservation of seed): কৃত্রিম সংকারয়ণে সৃষ্ট ফল পরিপক্ক হলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করে রৌদ্রে বা ইনকিউবেটরে ভালোভাবে শুকিয়ে প্যাকেটজাত করে পরবর্তী বছর চাষের জন্য সংরক্ষণ করতে হয়।

৮। F বংশধরের উদ্ভব (Raising of F generation): প্রথম সংকরায়ণে সৃষ্ট বীজ পরবর্তী বছর জমিতে বপন করলে যে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় তাদের সকলেই F_1 হাইব্রিড জাতের। এ F_1 জাতের মধ্যে আন্তঃসংকরায়ণ ঘটিয়ে F_2 এবং এভাবে F_6 পর্যন্ত বংশধর সৃষ্টি ও নির্বাচন করে উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদের প্রকরণ উদ্ভাবন করা হয়।

উদ্ভিদ বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা

অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য সারা বিশ্বে উদ্ভিদের ব্যাপক কৃত্রিম প্রজনন ঘটানো হচ্ছে। এতে অনেক প্রাকৃতিক উদ্ভিদ প্রজাতির পরিবর্তিত রূপ সৃষ্টি হচ্ছে যারা উদ্ভিদের বিবর্তনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। যেমন-

১। নতুন প্রকরণ (জাত) সৃষ্টি: কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন নতুন প্রকরণ বা জাত সৃষ্টি করা হয়েছে যেগুলো অধিক ফলনশীল।

২। রোগ ও বালাই প্রতিরোধক্ষম প্রকরণ সৃষ্টি: কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের ভাইরাস, ছত্রাক ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩। **ধানের সহনশীল প্রকরণ উদ্ভাবন:** কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ধানের বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৪। **বীজহীন ফল সৃষ্টি:** কৃত্রিম প্রজননের পলিপ্লয়ডি প্রক্রিয়ায় বীজহীন আঙুর, কলা, তরমুজ, লেবু, আপেল ইত্যাদি ফল সৃষ্টি করা হয়েছে।

কৃত্রিম প্রজননে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাতকে বিজ্ঞানীরা সিলেকশান পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারণ করছে যেগুলো নতুন পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে পরবর্তী বিবর্তনে অংশগ্রহণ করছে।

কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন মানুষের অর্থনীতির গতিকে সচল রাখছে। অর্থনীতির যেসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজনন মুখ্য ভূমিকা রাখছে তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। **ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে:** বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের প্রধান খাদ্য শস্য হলো ভাত। ভাত আসে ধান থেকে। প্রাকৃতিক প্রকরণজাত ধান উৎপাদন হলে বিশ্বের অনেক মানুষ আজ ক্ষুধার্ত থাকতো। কিন্তু কৃত্রিম প্রজননে সৃষ্ট হাইব্রিড ধান মানুষের ক্ষুধাকে জয় করেছে। চীন, ভিয়েতনাম, জাপান, ফিলিপাইন, লাওস, ভারত, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে হাইব্রিড ধান চাষ করে খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কয়েক ধরনের উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে সেগুলোর ফলন স্বাভাবিক ধান হতে কয়েকগুণ বেশি। এসব ধানের মধ্যে ব্রি-৭০, ব্রি-৭১, ব্রি-৭২, ব্রি-৭২, ব্রি-৫, ব্রিশাইল, চান্দিনা, মুক্তা (ব্রি-১০), গাজী (ব্রি-১৪), শাহীবালাম (ব্রি-১৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২। **গম উৎপাদন:** বিশ্বের মানুষের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য হলো গম। নরম্যান আর্নেস্ট বোরল্যাঙ্গ (Norman Ernest Borlaug, 1914-2009) কৃত্রিম সংকরায়ণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল ও খরা সহিষ্ণু গমের প্রকরণ সৃষ্টি করেছেন যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাষ করা হয়। তিনি বিশ্বে গম উৎপাদনকে প্রায় দ্বিগুণ করেছেন। এজন্য নরম্যান আর্নেস্ট বোরল্যাঙ্গকে সবুজ বিপ্লব বা গ্রিন রেভ্যুলেশন-এর জনক বলা হয়। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বিজ্ঞানীকে 1970 সালে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। বাংলাদেশের গমের অধিক ফলনশীল জাতগুলো হলো গৌরব, শতাব্দী, প্রদীপ, বারি গম-২৫, বারি গম-২৬, কাঞ্চন ইত্যাদি।

৩। **ভুট্টা উৎপাদন:** ত্রিশের দশকে বাণিজ্যিকভাবে ভুট্টার আবাদ শুরু হয়। বর্তমানে এটি বিশ্বের অন্যতম প্রধান শস্য যা পোল্ট্রি খাদ্যোৎপাদনে ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ভুট্টার অধিক ফলনশীল সংকর জাতগুলো হলো: খ-৯৪৫১, পোযা-১১, পোযা হাইব্রিড-১, পোযা হাইব্রিড-২ ইত্যাদি।

৪। **হাইব্রিড ফল ও সব্জি উৎপাদন:** কৃত্রিম সংকরায়ণের মাধ্যমে তরমুজ, আপেল, নাসপাতি, আম, বরই ইত্যাদি ফল এবং শসা, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙ্গা, লাউ, টমেটো, বাঁধাকপি ইত্যাদি সব্জি উৎপাদন করে বাজারজাত করা হচ্ছে। বীজহীন ফল ও সব্জি কৃত্রিম প্রজননের সুফল।

৫। **ফুল ও অর্কিড উৎপাদন:** বর্তমানে গোলাপ, গ্ল্যাডিওলাস, রজনীগন্ধা, গাঁদা ইত্যাদি ফুল ও বিভিন্ন প্রকার অর্কিডের অধিকাংশই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদন করা হচ্ছে।

৬। **রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রকরণ সৃষ্টি:** কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অনেক উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। **প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু উদ্ভিদ সৃষ্টি:** কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন শস্য ও ফল প্রদানকারী উদ্ভিদের বন্যা, খরা, শৈত্য, লবণাক্ততা ইত্যাদি সহিষ্ণু প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে।